বিজয়িনী

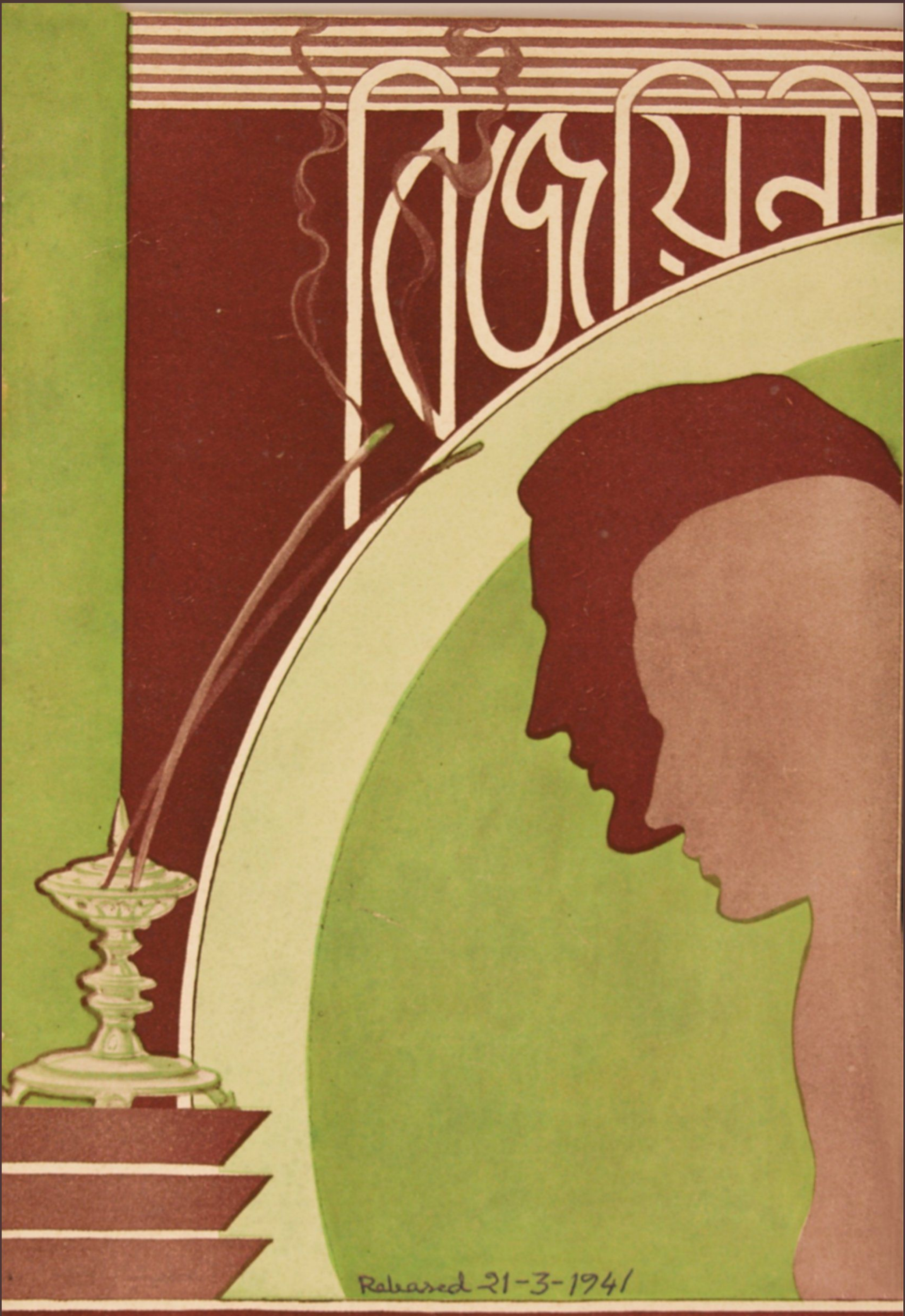

Released 21-3-1941

চিত্রবাণী লিমিটেড্

চিত্রবাণী লিমিটেডের নিবেদন

★

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
ষ্টুডিওতে আর-সি-এ
শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

★

একমাত্র-পরিবেশক

এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

৩২।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্ ঃ ঃ কলিকাতা।

বিজয়িনী

ভূমিকায় ঃ

চন্দ্রাবতী
রমা ব্যানার্জ্জি
উষাবতী
কমলা (ঝরিয়া)
রেবা বোস্

লীলা চৌধুরী
অপর্ণা
মনোরমা (বড়)
মনোরমা (ছোট)
স্বর্ণা পাল

রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্তোষ সিংহ
জহর গাঙ্গুলী
তুলসী লাহিড়ী
সত্য মুখার্জ্জি
সোমনাথ ভট্টাচার্য্য
দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানী দাস
তুলসী চক্রবর্ত্তী
মিহির ভট্টাচার্য্য
প্রবোধ মুখোপাধ্যায়
অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য
জহর দত্ত
পূর্ণেন্দু
গোরাচাঁদ ইত্যাদি

কর্ম্মী-সঙ্ঘ ঃ

কথা, কাহিনী ও পরিচালনায় ঃ

তুলসী লাহিড়ী

সহকারী ঃ জ্যোতি সেন

○

আলোক-চিত্রে ঃ বিভূতি দাস
সহকারী ঃ শচীন দাসগুপ্ত, দিব্যেন্দু ঘোষ

○

প্রধান-যন্ত্রী ঃ চার্লস্ ক্রীড্
শব্দ-যন্ত্রে ঃ মান্না লাডিয়া
সহকারী ঃ সুনীলকুমার ঘোষ

○

রসায়নাগারে ঃ জগৎ রায়চৌধুরী, পূর্ণ চ্যাটার্জ্জি
সহকারী ঃ অশোক, প্রফুল্ল, যুগল

সম্পাদনায় ঃ সুকুমার মুখার্জ্জি, সুধীন্দ্র পাল
স্থির-চিত্রশিল্পে ঃ দীনেশ দাস
ধারারক্ষণে ঃ কুমার সেন
রূপসজ্জায় ঃ কালিদাস দাস
সজ্জাগঠনে ঃ সরযূ লাডিয়া, লালমোহন রায়
কারুশিল্পে ঃ মতিলাল
গীতিকার ঃ শৈলেন রায়
যন্ত্রীবৃন্দ ঃ পরিতোষ, অমর, রাজেন
মাউথ অর্গান ঃ ননী দাসগুপ্ত, বীরেন দত্তগুপ্ত

বিজয়িনী

যে বয়সে অতি সহজেই নরনারী প্রেমে পড়ে, শকুন্তলা ও হরবিলাসের পরিচয় ঠিক সে-বয়সে হয় নাই,—হইয়াছে অনেক পরে, যৌবনের প্রায় প্রান্ত ভাগে। তথাপি প্রথম পরিচয়েই উভয়কে উভয়ের বেশ ভাল লাগিয়াছিল। ভাল বাসিয়াছিল উভয়েই।

এই ভালবাসার স্মরণীয় অধ্যায় সুরু হয় গিরি প্রান্তর গিরিডির পথে—একান্ত নির্জ্জনে।

সেদিন তাহারা গিয়াছিল উশ্রী প্রপাতের ধারে—বনভোজন উপলক্ষ্যে। সঙ্গীদের সেখানে রাখিয়া উভয়ে বাহির হইল মোটর বিহারে। একটা পথের বাঁকে পৌছিয়া হঠাৎ ইঞ্জিন বিগ্‌ড়াইয়া গেল, অনেক চেষ্টা করিয়াও মোটরের চাকা আর চলিল না। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল।

সমূহ বিপদ ত আছেই—তা'ছাড়া আছে মিথ্যা কলঙ্কের ভয়। সেই ভয়েই শকুন্তলা শঙ্কিত হইয়া পড়িল। সে যে আবার শিক্ষয়িত্রী! চরিত্রে কলঙ্ক রটিলেই সর্ব্বনাশ!

তাহার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া হরবিলাস আশ্বাস দিয়া বলিল—ভয় করিবার কি আছে—সমস্যাটা যত গুরুতরই হোক্ তার সমাধান ত সহজেই হইতে পারে এবং সে উপায়ও রাহিয়াছে তাহাদেরই হাতে।

সহসা শকুন্তলা দেখিল আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে,—আর হরবিলাসের চোখে পড়িল চন্দ্রালোকে শকুন্তলা যেন এক নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে।

হরবিলাস মুগ্ধ দৃষ্টিতে শকুন্তলার পানে তাকাইয়া ভয়ে ভয়ে প্রেম নিবেদন করিল এবং তাহার হাতখানি হাতে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করিল বিবাহের। হরবিলাসের প্রস্তাব শকুন্তলা সাগ্রহে অনুমোদন করিল। স্থির হইল—পরদিন বৈকাল ছ'টার মধ্যে শকুন্তলা তাহার অভিভাবকদের মতামত জানাইবে।

কিন্তু বাড়ী ফিরিয়াই শকুন্তলা টের পাইল তাহাদের ব্যাপার লইয়া অনেককিছু আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং আরও শুনিল যে তাহার পিতামাতার বিবাহে যে সামাজিক দোষ ছিল তাহাই তাহাদের এই বিবাহে বিঘ্ন হইয়াছে। মুহূর্ত্তে তাহার কল্পনার সংসার মনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

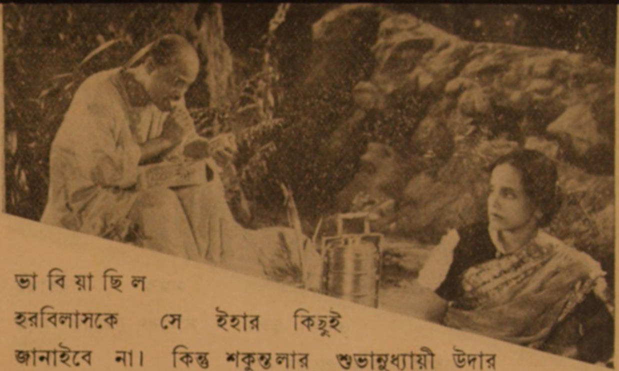

ভাবিয়াছিল হরবিলাসকে সে ইহার কিছুই জানাইবে না। কিন্তু শকুন্তলার শুভানুধ্যায়ী উদার চরিত্র বিমাতামহ তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন—"তোমার সেখানে যাওয়া উচিত। তাহাকে সকল কথা বলা উচিত। তা না হইলে সে নিশ্চয়ই ভুল বুঝিবে এবং মনে দুঃখ পাইবে।"

শকুন্তলা দেখিল ছ'টা বাজিয়া গিয়াছে, আর দেরী করিলে হয়'ত হরবিলাসের সহিত দেখা হইবে না। দাদুর অনুমতি পাইয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাড়াতাড়িতে যাইবার সময় চশমা লইতে ভুলিয়া গেল।

দুর্ভাগ্য যখন আসে এমনি ভাবেই আসে। বাড়ীর কাছেই রাস্তা পার হইবার সময় মোটরের ধাক্কা খাইয়া সে পড়িয়া গেল। আহত অবস্থায় সেই মোটরেই তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইল।

এদিকে হরবিলাস শকুন্তলার প্রতীক্ষায় ছট্‌ফট্ 'করিতেছিল—নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার অনেক পরেও যখন শকুন্তলা আসিল না তখন সে হতাশ হইয়া পড়িল। সে ভাবিল শকুন্তলার আগাগোড়া

সমস্ত ব্যবহারই একটা ছলনা। সাধারণ মেয়ের সঙ্গে তাহার কোন প্রভেদ নাই।

ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে ও বেদনায় জর্জ্জরিত হরবিলাস সেই রাত্রেই গিরিডি হইতে কলিকাতায় রওনা হইল।

... ...

মোটরে ধাক্কা খাইয়া শকুন্তলার একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল,—অনেক দিন তাহাকে শয্যাগত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। সেই অবস্থায়ই সে স্কুলের চাকুরীতে ইস্তফা দিল। কি জানি,—সুস্থ হইয়া কাজে যোগ দিলে তখন যদি হরবিলাসের ব্যাপার লইয়া পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে! কুলোকের মুখ সে বন্ধ করিবে কি করিয়া! কিছুদিন পরে ডাক্তার তাহার পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দিলেন। দেখা গেল পায়ের হাড় জোড়া লাগিয়াছে, কিন্তু পা একটু ছোট হইয়া গিয়াছে। চিরজীবনের মত তাহাকে খোঁড়াইয়া চলিতে হইবে। সেজন্য সকলে দুঃখিত হইল—কিন্তু শকুন্তলার নিজের যেন কোন দুঃখই হইল না। জীবনের লাভ লোকসান যেন তাহার কাছে এক হইয়া গিয়াছে।

শকুন্তলার এ দুর্গতির সংবাদ হরবিলাস পাইল না। পাইলে, হয়ত আর কাহাকেও সে বিবাহ করিত না। শকুন্তলার প্রতি আক্রোশে এবং মায়ের ঐকান্তিক আগ্রহে অবিলম্বে সে বিবাহ করিয়া ফেলিল। বিবাহ করিয়া সে শকুন্তলাকে ভুলিতে চেষ্টা করিল।

কিন্তু যাহাকে বধূরূপে বরণ করিয়া হরবিলাস ঘরে আনিল—হরবিলাসকে ঘরের দিকে টানিবার আগ্রহ তাহার ছিল না, হরবিলাসের ঐশ্বর্য্যে দেহ এলাইয়া দিয়া তাহাকে সে ভারবাহী প্রতিপন্ন করিয়া তুলিল। ঐশ্বর্য্যের অপচয় ও বিলাসের স্রোত হরবিলাসের চোখের সমুখেই চলিল। হরবিলাস দ্বন্দ্ব ও অশান্তির ভয়ে নীরবে নিজের হাত কামড়াইতে লাগিল। কিন্তু এতখানি সহ্য করিয়াও সে স্ত্রীর মন পাইল না, বরং স্ত্রীর তাচ্ছিল্য ও দাম্ভিকতা বাড়িয়াই চলিল।

যে-দিন শিশু পুত্রটিকে আদর করিতে গিয়া স্ত্রীর নিকট হরবিলাসকে তীব্র লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হইল সে-দিন তাহার মনে হইল, বিবাহ করাই ভুল হইয়াছে। সে চাহিয়াছিল ফুলবন রচনা করিয়া আনন্দে দিন যাপন করিতে, কিন্তু অদৃষ্টদোষে তাহা কাঁটাবনে পরিণত হইয়া প্রতিনিয়ত তাহাকে ক্ষতবিক্ষতই করিতে লাগিল।

মনের জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া হরবিলাসের শরীরও খারাপ হইয়া পড়িল। ডাক্তারের পরামর্শে সে প্রতিদিন বৈকালে লেকের ধারে বেড়াইতে যাইত। একদিন দৈবক্রমে সেখানে তাহার দেখা হইয়া গেল শকুন্তলার সঙ্গে।

কত দিন পর দেখা—
কত দিন পর!

কেহই যেন কোন কথা খুঁজিয়া পায় না। তারপর সে অবস্থাটা যখন কাটিয়া গেল তখন প্রথমে কথা বলিল হরবিলাস। কিন্তু হরবিলাসের কথায় আজ শুধুই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর বিষের জ্বালা। যে-আঘাত ও যে-বেদনা একদিন সে শকুন্তলার জন্য পাইয়াছে আজ সে যেন তাহা সুদে আসলে ফিরাইয়া দিতে চায়!

কিন্তু শকুন্তলা স্থির ও গম্ভীর। পর পর আঘাত পাইয়াও সে নিশ্চুপ। সবই যেন তাহার প্রাপ্য বলিয়া সে মানিয়া লইল।

শকুন্তলার আহত মুখের পানে তাকাইয়া হরবিলাস নিজেও ব্যথিত হইয়া উঠিল। তারপর নিজের গাড়ীতে শকুন্তলাকে তাহার বাড়ী

পৌঁছাইয়া দিল। সহসা সে দেখিল শকুন্তলা খোঁড়াইয়া চলিতেছে। আর্ত্তকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—"একি! তোমার কি হইয়াছে?"

প্রশ্নটা শকুন্তলা একরকম উপেক্ষা করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু হরবিলাসের অত্যাধিক পিড়াপীড়িতে সে সব কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিল না। সমস্ত শুনিয়া নিজের প্রতি হরবিলাসের ধিক্কার জন্মিল। সে যদি রাগ করিয়া সেদিন গিরিডি হইতে চলিয়া না আসিত তাহা হইলে আজ তাহাদের জীবন হয়ত এমন করিয়া ব্যর্থ হইত না।

হরবিলাস স্থির করিল তাহাদের জীবন সে ব্যর্থ হইতে দিবে না। আবার নূতন করিয়া তাহারা জীবনের অধ্যায় সুরু করিবে। এবার তাহারা নূতন জীবন যাপন করিবে। হরবিলাস শকুন্তলাকে তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিল। কিন্তু শকুন্তলা তাহাতে সম্মত হইল না।

হরবিলাসের বিবাহিত জীবনে তাহার স্থান কোথায়? তা' ছাড়া এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে আবার বিবাহ করাও বিড়ম্বনা মাত্র।

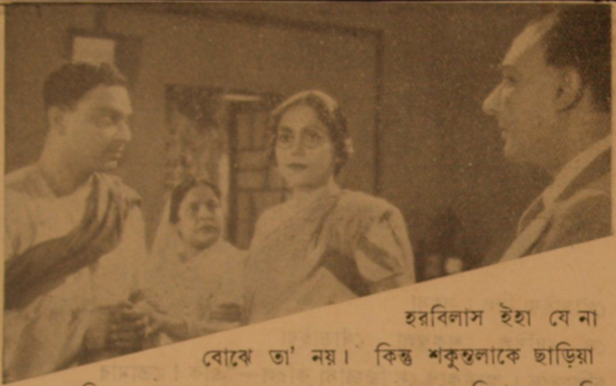

হরবিলাস ইহা যে না বোঝে তা' নয়। কিন্তু শকুন্তলাকে ছাড়িয়া থাকিতে আর তাহার মন চায় না। অন্ততঃ দিনান্তেও যদি একটিবার তাহাকে দেখিতে পায় তাহা হইলেও সে একটু শান্তি পাইবে।

অবশেষে হইলও তাহাই। হরবিলাস প্রতিদিন বৈকালে একবার করিয়া শকুন্তলার বাড়ী আসিত এবং চায়ের পেয়ালা সুমুখে লইয়া তাহারা বৈষ্ণব কবিতার আলোচনা করিত। অবশেষে কামগন্ধহীন বৈষ্ণব প্রেমে তাহারা নূতন করিয়া উভয়ে উভয়কে পাইল।

মিলনের পাত্রখানি যখন পূর্ণ হইয়া আসিল, তখনই আবার বিচ্ছেদের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। ব্যবসায় উপলক্ষ্যে ভারতের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের জন্য হরবিলাসকে কিছুদিনের জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইল। শকুন্তলা সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল কিন্তু লোক লজ্জার ভয়ে তাহাকে সে সঙ্গে লইতে রাজি হইল না। বলিয়া গেল প্রতিদিন সে তাহাকে চিঠি দিবে এবং শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু বাহিরে গিয়া নিয়মিত সে চিঠি দিতে পারিল না এবং শীঘ্র ফিরিয়া আসাও তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। কলিকাতায় ফিরিয়াও

এমন কতকগুলি জরুরী কাজে সে আটকাইয়া পড়িল যে, দিন কয়েকের মধ্যে শকুন্তলার সঙ্গে দেখা করিবার ফুরসৎও পাইল না।

ইতিমধ্যে কিন্তু হরবিলাসের প্রত্যাগমন সংবাদ শকুন্তলা তাহার ভগ্নীপতির মারফৎ পাইয়াছিল এবং দৈনিক পত্রেও পড়িয়াছিল। হরবিলাসের উপর শকুন্তলার অভিমান হইল। অভিমান করিয়া সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গিরিডি চলিয়া গেল।

হরবিলাস তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া তাহার বিদায়-লিপি পাইল। হরবিলাসের মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। শকুন্তলার অভাবে তাহার মন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। হরবিলাস বুঝিতে পারিল শকুন্তলা তাহার জীবনের কতখানি অধিকার করিয়া আছে।

হরবিলাস আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। শকুন্তলাকে ফিরাইয়া আনিতে ছুটিয়া গেল গিরিডিতে—সোজা গিয়া সে শকুন্তলার বাড়ী উঠিল। শকুন্তলা প্রথমে ফিরিতে সম্মত হইল না। কিন্তু পরে যখন দেখিল তাহার ভগ্নীপতি ও বিমাতার কাছে হরবিলাসকে তাহার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হইতেছে, তখন হরবিলাসকে অপমানের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য শকুন্তলা নিজেই কৈফিয়ৎ দিল। সে বলিল—

"আমাকে উনি নিয়ে যেতে এসেছেন, আমি ওঁরই আশ্রিতা।" এই বলিয়া সে উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই হরবিলাসের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া হরবিলাস প্রতিজ্ঞা করিল, শকুন্তলাকে ছাড়িয়া সে একলা আর কোথাও কখনও যাইবে না এবং ইহার পর পনর বৎসরের মধ্যে সে কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যায়ও নাই। এমন কি, কোন অবস্থায়ই সে কোনদিন বৈকালে শকুন্তলার বাড়ী আসিতে এতটুকুও দেরী করে নাই।

এই পনর বৎসরে হরবিলাস বার্দ্ধক্যে আসিয়া পৌছিয়াছে। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় ডাক্তার বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য হরবিলাসকে বাহিরে যাইতে বলিয়াছে—এবার কিন্তু হরবিলাস শকুন্তলাকে না লইয়া বাহির হইল না।

... ...

ব্যাণ্ডেলে গিয়া গাড়ীতে উঠিলে পরিচিত লোকের দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে হরবিলাস ইহাই ভাবিয়াছিল। কিন্তু পুত্রের কাছে সে ধরা পড়িয়া গেল! পিতা পুত্রে এই বিষয় লইয়া সাক্ষাতে কোন কথাবার্ত্তা হইল না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমে অত্যন্ত জটিল হইয়া দাঁড়াইল।

পুত্র ভাবিল তাহার দেবতুল্য পিতার জীবনে ইহাই একমাত্র কলঙ্ক এবং এই কলঙ্কের জন্যই তাহাকে লোকের কাছে মাথা হেঁট করিতে হয়।

পুত্র ভাবিল এ কলঙ্ক পিতাকে সে আর বহন করিতে দিবে না। স্থির করিল—যেমন করিয়াই হো'ক পিতাকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে হইবে। সে গাড়ী লইয়া শকুন্তলার গৃহে উপস্থিত হইল। টাকার লোভ দেখাইয়া সে শকুন্তলাকে দূর করিবার চেষ্টা করিল।

দশ হাজার! বিশ হাজার!! পচিশ হাজার!!!

কিন্তু শকুন্তলা নীরব। হরবিলাস তাহাকে কতদিন কত দিতে চাহিয়াছে কিন্তু কিছুই সে গ্রহণ করে নাই—আর আজ? আজ তাহারই পুত্র আসিয়াছে তাহাকে টাকার লোভ দেখাইতে! ইহার চাইতে অপমান তাহার জীবনে আর কি হইতে পারে? দুঃখে ও অপমানের বেদনায় তাহার দুইচোখ বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

এমন সময় হরবিলাস আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রের এই ব্যবহারে সে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইল। অসহ্য বেদনায় টলিতে টলিতে কোন রকমে সে নিজেকে সামলাইয়া বাহির হইয়া গেল। বোধকরি ইহাই তাহাদের শেষ বিদায়!

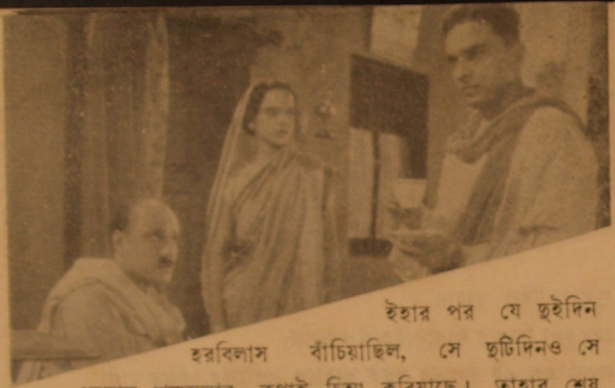

ইহার পর যে দুইদিন হরবিলাস বাঁচিয়াছিল, সে দুটিদিনও সে একমাত্র শকুন্তলার কথাই চিন্তা করিয়াছে। তাহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও টেলিফোনে সে শকুন্তলাকেই ডাকিয়াছে।

হরবিলাসের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বুঝিতে পারে শকুন্তলার প্রতি তাহার পিতার প্রেম ছিল সমুদ্রের মতই সীমাহীন কিন্তু কামনার কলুষ তাহাকে লবণাক্ত করে নাই। কাঞ্চন মূল্যে যাহাকে ক্রয় করা যায় না এমন একটী নারীকেই তাহার পিতা নিঃশেষে সমস্ত প্রেম ঢালিয়া দিয়াছে, আর সে-প্রেমের মর্ম্ম না বুঝিয়া সেই নারীকে রজতের প্রলোভন দেখাইয়া সে অপমান করিয়াছে।

অনুতপ্ত হইয়া হরবিলাসের পুত্র শকুন্তলার কাছে গিয়া উপস্থিত হয়। মাতৃ সম্বোধনে সে শকুন্তলাকে তাহার যথার্থ মর্য্যাদা দিয়া মাতৃস্থানীয় করিয়া লয়।

শকুন্তলার নারীজন্ম সার্থক হইয়া উঠে এই মাতৃ সম্বোধনে। এই একমাত্র সম্বোধনে সে তার জীবনব্যাপী ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করে। আত্মত্যাগেই শকুন্তলা বিজয়িনী হইয়া উঠে।

সঙ্গীত

(১)

যদি বিলিয়ে দিতে চাস্‌রে হৃদয়
কিসের এ সংশয় ?
যদি পরাণ চলে চরণ কেন
বাঁধা পড়ে' রয়।
কেন রে তোর পোষমানা প্রাণ
বদ্ধ খাঁচায় গাইবে রে গান,
ও তুই জ্বালবি যদি প্রাণের আগুন
জ্বলতে কেন ভয় ?

—শৈলেন রায়।

(২)

হরি রহ মানস সুরধুনী পার।
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
কেমনে যাবি ?
সুরধুনী পারে কেমনে যাবি ?
ল'য়ে অহঙ্কারের পশরা তোর
সুরধুনী পারে কেমনে যাবি ?
মন্দির বাহির কঠিন কপাট
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট,
দেহ যাবে না, যাবে না
মন যদি যায়, প্রাণ যাবে না
ও তোর অহংজ্ঞানের
কপাট ভেঙ্গে
এ দেহ তোর যাবে না।
তহি অতি দূরতর বাদল দোল
বারি কি বারই নীল নিচোল,
অতি ক্ষীণ—বিশ্বাস তোর
অতি ক্ষীণ
নীল নিচোল সম সদাই দোলে।

—গোবিন্দ দাস।

জয়মালা পর গলে
আজি তোমারে বরিব হে।
তারার দীপালি জ্বালি
আঁখি তলে
আরতি করিব হে।
জাগায়ে রহিব বসি
তব ভাগ্য রাতের শশী
গৌরবে তব সৌরভ লভি
পরাণ ধরিব হে।

—শৈলেন রায়।

কালিক অবধি কইয়ে পিয়া গেল
লিখইতে কালি ভিত ভরি' গেল।
সজনী, কি কহব বিরহ বিযাদ
তিল এক পিয়া বিনে যো
কহে যুগ শত
তাহে কি এত হুঁ পরমাদ।
পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধাওল
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহ
না বুঝিয়ে রীত, ভীত রহুঁ অন্তর
কত পরবোধব কেহ।

—মহাজন পদাবলী।

ASSOCIATED DISTRIBUTORS LTD. • CALCUTTA •

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক
এসোসিয়েটেড্ ডিষ্টি-
বিউটার্স লিঃ-এর
তরফ হইতে সম্পা-
দিত এবং প্রকাশিত।
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫, ডি, এল, রায়
ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে
শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।